ওমর খৈয়াম

ইয়াসমিন সুলতানা

ঐতিহ্য

আমার ইতিহাস-বেত্তা বাবা সানাউল্লাহ নূরীকে

ভূমিকা

ওমর খৈয়াম সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার উৎসাহ জাগে হ্যারল্ড ল্যাম্ব-এর 'ওমর খৈয়াম' বইটি পড়ে। সেটি বহুকাল আগের কথা। আবারও যখন বইটি পড়ি তখন ইচ্ছেটা বেশ জাঁকিয়ে বসে। বেশিরভাগ লোক তাঁকে তাঁর 'রুবাইয়াৎ'–গদ্য কবিতা পড়ে চেনেন। তিনি যে সে সময়ের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন, সেটি যেন ম্লান হয়ে গেছে তাঁর রুবাইয়াৎ-এর কাছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার মুশকিল হলো সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া। যাঁরা তাঁর ওপর লিখেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে। সে সময়ে কে, কীভাবে তাঁকে দেখেছেন তা বিবেচনায় রাখার প্রয়োজন আছে। কেউ তাঁকে খোলা জানালা দিয়ে দেখেছেন, কেউ দেখেছেন ঘুলঘুলি দিয়ে। মধ্যযুগের ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস–কূপমণ্ডূকতার প্রেক্ষাপটে ওমর খৈয়ামের 'সত্য আবিষ্কার' যেন অপরাধ। কেউ কেউ ওমর খৈয়ামের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন শুধু তাঁর রুবাইয়াৎ পড়ে। যেখানে সরাইখানা, শরাব আর সাকির ছড়াছড়ি। এসব সীমাবদ্ধতা নিয়েই বইটি লেখার প্রয়াস।

ওমর খৈয়ামকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কম হয়নি। একদল তাঁকে ধর্মহীন, ধর্মদ্রোহী, রূঢ় প্রকৃতির, রহস্যময়, সুখবাদী দার্শনিক ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছেন। অনেক সুফিবাদী তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত করেছেন। আরেকদল, তিনি যে কতটা ধর্মপ্রাণ ছিলেন তা বলার চেষ্টা করেছেন। ওমর খৈয়াম যে জ্ঞানী, বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী ছিলেন এটা নিয়ে মনে হয় কোনো পক্ষেরই দ্বিমত ছিল না।

সে সময়ের পারস্যের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট–

সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন ৫৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। 'শাহনামা'য় ফেরদৌসী সম্ভবত তাঁকে কায়খসরু বলে অভিহিত করেছেন। বাদশাহ কায়খসরুই রোমসহ তুরান (তুর্কিস্তান, উজবেকিস্তান, বল্‌খ, বুখারা, সিরিয়া)-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার দেশ পারস্য বা আজকের ইরান শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব নানা শাখায় সূক্ষ্ম জালের মতো আমাদের মননে এবং হৃদয়ে জড়িয়ে আছেন পারস্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। ফেরদৌসী, ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, ইমাম আল-গায্‌যালি, জালালুদ্দিন রুমি, শেখ সাদী, হাফিজ আরও অনেকে। সুমধুর ফারসি

ভাষায় রচিত ফেরদৌসীর শাহনামা, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ, হাফিজের দেওয়ান, সাদীর গুলিস্তাঁ ও বূস্তাঁ বিশ্বসাহিত্যকে উচ্চতর আসনে বসিয়েছে। খোরাসান, নিশাপুর, শিরাজ, ইস্ফাহান, হামাদান এসব অঞ্চল সমৃদ্ধ হয়েছে গুণী-জ্ঞানী, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের পদচারণায়।

সম্ভবত পারস্যের যরোয়াস্ট্রিয়ান সংস্কৃতি, ইসলামিক সভ্যতার প্রভাব, মিশরীয়, ব্যবিলনীয় এবং গ্রিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, তাদের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ওমর খৈয়ামের জ্ঞান নানা শাখায় প্রবাহিত করেছিল। মুসলিমরা গণিত ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেও তখনকার শাসকরা গ্রিক পণ্ডিতদের লেখা বই আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। অষ্টম শতকে বাগদাদের খলিফা আল-মনসুর (৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এর কথাই বলি। তিনি বিজ্ঞান বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সময়ে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, টলেমি, ইউক্লিডসহ অন্যান্য গ্রিক চিন্তাবিদের লেখা আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। এর ফলে মুসলিমরা একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেল। তারা প্রাচীন গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারীদের লেখার সাথে পরিচিত হলো এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যার ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করল। আল-মনসুরের পরে আল-মামুন খলিফা হলেন। তিনি মুতাজিলাদের যুক্তিনির্ভর ধর্মতত্ত্বের ওপর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে এগারো/বারো শতকেই মুসলিম জ্ঞানী-গুণীদের অভূতপূর্ব অর্জনগুলো ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে। ওমর খৈয়াম তাঁর সময়ে বৈজ্ঞানিক চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা এবং পরবর্তীকালে এর ওপর নেতিবাচক মনোভাব দুটোই প্রত্যক্ষ করেছেন।

ওমর খৈয়াম তাঁর বেশ কয়েকটি রুবাইতে ফেরদৌসীর শাহনামায় বর্ণিত প্রতাপশালী কয়েকজন নৃপতি ও বীর যোদ্ধার পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। শাহানামা পারস্যের জাতীয় মহাকাব্য। শুধু পারস্য কেন একে বিশ্বের অমর মহাকাব্য বলে অভিহিত করা হয়। এটি ওমর খৈয়ামকে যে প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর রুবাইতে দেখতে পাওয়া যায়।

ফেরদৌসী আবু মনসুর দাকিকির কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। দাকিকি মাত্র হাজারখানেক পঙ্‌ক্তি লেখার পরেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লেখা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ফেরদৌসী শাহনামা লিখতে শুরু করেন। ত্রিশ বছর লেগেছে এটি শেষ করতে। তাঁর রচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ষাট হাজার পঙ্‌ক্তি/শ্লোক। জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফ শাহনামা অনুবাদ করেছেন অত্যন্ত ঝরঝরে বাংলায়। ছয় খণ্ডে সমগ্র শাহনামা অনূদিত হয়েছে। শাহনামার প্রথম খণ্ডে মনিরউদ্দীন ইউসুফের লেখা ভূমিকাটিও চমৎকার। শাহনামা কাব্যের ঘটনাবলির পটভূমির সাথে তিনি পারস্য তথা মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ বলছেন, ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ইরানীয় সাহিত্যকে যে-প্রকাশভঙ্গি ও মননশীলতার অধিকারী করে গেল, তারই ধারা অনুসরণ করে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম রচনা করলেন তাঁর কালজয়ী 'রুবাইয়াৎ', নিজামী তাঁর 'সিকান্দরনামা' ও 'য়ুসূফ-জোলেখা', প্রাচ্যের শেক্সপীয়ার শেখ সাদী তাঁর 'গুলিস্তাঁ', 'বূস্তাঁ এবং জালালউদ্দিন রুমি তাঁর বিখ্যাত 'মসনবি'। সুফিবাদ অনুপ্রাণিত কাব্য হিসেবে রুমির মসনবি বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

ফারসি ভাষা (পূর্বের পহলভি যা মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল) বিখ্যাত লেখকদের হাত ধরে এক আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফারসি ভাষা ভারতের রাজভাষার মর্যাদা পেয়ে প্রায় চার হাজার মাইলব্যাপী এক ব্যাপক এলাকার মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হয়ে দেখা গিয়েছিল। ওমর খৈয়ামের কিছু রুবাই আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে। অনেকে আরবি ভাষার অন্ধ কবি আবুল-আলা মা'ড়ির কবিতার উদাহরণ টেনে বলেন, তাঁর কবিতা পড়ে ওমর প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এবার খোরাসানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। খোরাসান তখন পারস্যের রাজধানী। খোরাসানের নিশাপুর ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। খোরাসানের একটি সেরা শহর বলে খ্যাত নিশাপুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক এগিয়ে ছিল। বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে লোকজন এখানে এসে ভিড় করত। সরাইখানাগুলো গমগম করত বিদেশিদের পদভারে। সরাইখানাগুলোয় পরিবেশিত সুস্বাদু খাবার, পানীয় ও আতিথেয়তা বিদেশিদের আকর্ষণের আরেকটি অনুষঙ্গ। বাগানঘেরা প্রশস্ত বাড়ি, মসজিদের সুউচ্চ মিনার, বাহারি কাপড়, তৈজসপত্র ও মণিমাণিক্য নিয়ে সুসজ্জিত দোকানপাট, মক্তবে ছাত্রদের পদচারণা, তাদের অনুসন্ধিৎসু যুক্তি-তর্ক, পণ্ডিত ব্যক্তিদের গুরুগম্ভীর আলোচনা, সর্বোপরি নগরবাসীদের বিত্ত-বৈভব ঈর্ষা করার মতোই বটে।

এই তো গেল খোরাসান। তখনকার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতেও নগরসভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। যেমন বাগদাদ, কুফা, বসরা, ওয়াসিত, মসুল, কায়রো এবং মাঘরেবের আরও কিছু নগর। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এই দুই বড় নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাগদাদ তখন ব্যবসা ও বাণিজ্যের বড় কেন্দ্রবিন্দু। পণ্য আসে ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, তুরস্ক, আবিসিনিয়া ইত্যাদি দেশগুলো থেকে। এর পাশাপাশি বাগদাদ তখন বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে চলেছে। নগরসভ্যতাগুলোতে যেন এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে কে কাকে ছাড়িয়ে যায়। বাদশাহর দরবার অলংকৃত করে রেখেছেন কোন পণ্ডিত বা বিদ্বান ব্যক্তিরা, সেটাও গৌরবের বিষয় ছিল। শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসকরা একদিকে যেমন সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাদর করেছেন। তাঁদের জ্ঞান বিকাশের জন্য অকৃপণভাবে অর্থ ব্যয় করেছেন। গজনির সুলতান মাহমুদ তো খোওয়ারেজমির সুলতান মামুনকে একরকম ভয় দেখিয়ে তাঁর বিখ্যাত পণ্ডিতদের হস্তগত

করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবু নসর, আবুল হাসান এবং জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী আলবিরুনী।

ওমর খৈয়ামের কথায় আসি।

১০৪৮ সালের ১৮ মে নিশাপুরে জন্ম হয় একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক ও কবি ওমর খৈয়ামের। তার পুরো নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল ফতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম। 'ওমর খৈয়াম' নামেই তিনি সুপরিচিত। ওমর খৈয়ামের বাবা ইব্রাহিম খৈয়াম। খৈয়াম অর্থ 'তাঁবু নির্মাতা'। যতদূর জানা যায় বাবা ইব্রাহিম খৈয়াম সেলজুক সুলতান তুঘ্রিল বেগের সময়ে তার সেনাবাহিনীতে তাঁবু নির্মাণের কাজ করতেন। খোরাসান তখন বীর তুঘ্রিল বেগ অর্থাৎ তুঘ্রিলদের অধিকারে ছিল। ইব্রাহিম খৈয়ামের পরিবার বলখ্ (বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল) থেকে নিশাপুরে থিতু হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে বেশিরভাগ গবেষকের মতে ওমর খৈয়ামের বাবা, দাদা, পরদাদারা নিশাপুরেরই লোক।

একজন দক্ষ তাঁবু নির্মাণকারী হিসেবে ইব্রাহিম খৈয়াম শহরে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম যে 'আরজুমন্দ' তা নিয়ে খুব নিশ্চিত হওয়া যায় না। ওমর খৈয়ামের বাল্যকাল নিয়ে খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতের কাছে নেই। তবে তাঁর উৎসুক মনের খোরাক যে তার মাতামহের কিতাবখানা ও নিশাপুরের কিতাবপট্টি থেকে ডালপালা মেলেছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনের শাখা-প্রশাখা থেকে সাহিত্য। নাওয়া-খাওয়া ভুলে বাজারের কিতাবপট্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বই পড়তেন ওমর। ভাবুক প্রকৃতির ওমর খৈয়াম ছেলেবেলা থেকেই গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, অবস্থান নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত।

একটু বড় হতেই বাবা ওমর খৈয়ামকে খোরাসানের বিখ্যাত এক মহান শিক্ষক 'ইমাম মুয়াফ্ফাক নিশাবুরি'র কাছে পড়াশোনার জন্য পাঠালেন। তিনি খুব যত্ন নিয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। ইমাম মুয়াফ্ফাক এই ছাত্রটিকে খুব পছন্দ করতেন। সব বিষয় খুঁটিয়ে জানা চাই। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হতো শিক্ষককে। অন্য ছাত্রদের হয়তো তেমন সাহসই ছিল না প্রশ্ন করার। ওমর খৈয়ামের চিন্তার গভীরতাকে বিস্তৃত করতে ইমাম মুয়াফ্ফাকের অবদান অনেক।

আরেকজন শিক্ষক ইমাম আলি ওমর খৈয়ামের শিক্ষাজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেন। তাঁর কাছে পড়েছেন বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা। এরপর ওমর খৈয়াম নিশাপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বহু পথ পাড়ি দিয়ে তিনি বুখারা ও সমরকন্দ প্রদেশে যান। বুখারার আর্ক-এর বিখ্যাত লাইব্রেরি হয়ে উঠল তাঁর জ্ঞান আহরণের আকর। সমরকন্দে এসে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ট্রিটিজ অন অ্যালযিব্রা' নিয়ে কাজ শুরু করেন। ওমরকে এ কাজে সমরকন্দের এক কাযি মতান্তরে গভর্নর প্রভূত সহায়তা করেছেন বলে মনে করা হয়।

ইমাম মুয়াফ্ফাকের তিনজন সৌভাগ্যবান ছাত্র যাঁরা ভবিষ্যতে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছিলেন। এঁরা হলেন, তুস শহরের হাসান ইবনে আলিতুসি–পরবর্তীকালে

বিখ্যাত উজিরে আজম নিজাম-উল-মুলক। দ্বিতীয় ছাত্র ওমর খৈয়াম এবং তৃতীয়জন হাসান সাব্বাহ। এই তিন বন্ধুকে নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ইমাম মুয়াফ্ফাকের গৃহে অধ্যয়নের সময় তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন–তিন বন্ধুর যেকোনো একজন যদি সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে ওঠেন তবে তার সৌভাগ্যের অংশ অন্য দুজনকে ভাগ করে দেবেন। ইমাম মুয়াফ্ফাকের কাছে অধ্যয়ন শেষে পারস্যের সুলতানের অধীনে আলিতুসি–নিজাম-উল-মুলক প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেন। নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতায় একসময় সুলতানের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। পরে সুলতান তাঁকে উজিরে আজম বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। নিজাম-উল-মুলকের সদিচ্ছায় ওমর খৈয়াম এবং হাসান সাব্বাহ দুজনেই একসময় রাজদরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, আসলে এই তিনজন একসাথে পড়াশোনা করেননি। নিজাম-উল-মুলক ওমর খৈয়ামের চাইতে বয়সে প্রায় ত্রিশ বছরের বড়। হাসান সাব্বাহ এবং ওমর খৈয়াম প্রায় সমবয়সী এবং তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। নিজাম ওমর খৈয়ামের পাণ্ডিত্যের কথা জেনে তাঁকে রাজদরবারে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তী সময়ে রাজদরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ওমর খৈয়াম নিজামকে হাসান সাব্বাহর নাম সুপারিশ করেন। কাজের সুবাদে এই তিনজনের মধ্যে একটি প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু হাসানের লালসা ও শঠতার কারণে নিজাম এবং হাসানের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল।

হাসান সাব্বাহ ইতিহাসে 'অ্যাসেসিন' কিংবা 'ওল্ড ম্যান অব দ্য মাউন্টেনস্' নামে পরিচিত। একসময় হাসান সাব্বাহ 'ইসমাইলিয়া' সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তার দল গুপ্তহত্যার সাথে জড়িত ছিল। সে সুবাদে 'অ্যাসেসিন' শব্দটি চালু হয়। ক্রুসেডের একাধিক খ্রিষ্টান নেতা এদের গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হন। এরা বাণিজ্য পথেও হামলা চালাত। বহু খ্রিষ্টান ও মুসলিম বণিককে হাসানের অনুসারী দল হাসানিয়ারা হত্যা করে। এ থেকে খ্রিষ্টানদের মুখে 'হাসানিয়া' এবং পরে এর অপভ্রংশ থেকে 'অ্যাসেসিন' শব্দের উৎপত্তি হয়। আরেকটি মত হলো, হাসান তার অনুসারীদের 'অ্যাসাসিউন' বলে ডাকত। এর অর্থ 'আসাস' বা বিশ্বাসের ভিত্তির প্রতি আস্থা স্থাপনকারী। বলা হয় পাশ্চাত্যের পর্যটকরা এই শব্দটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সুলতান মালিক শাহের সময় হাসান সাব্বাহ ও তার অনুসারীরা যে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল তার মূল উৎপাটন করতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মালিক শাহ কাজটি করতে পারেননি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরাও। একশ ছেষট্টি বছর পর ১২৫৬ সালে হালাকু খানের সময়ে মোঙ্গলরা আলামুত পাহাড় দখল করে তাদের দলের মূল শক্তিকে ধ্বংস করেছিল। মোঙ্গলদের দ্বিতীয় প্রবাহের এ অভিযানে কম রক্তপাত ঘটেছিল। সন্দেহাতীতভাবে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে প্রাচ্যের ওপর প্রথম মোঙ্গল অভিযানটি ছিল ভয়ংকর। এই আক্রমণের ফলে তখনকার কিছু সমৃদ্ধিশালী নগরী একেবারে ধ্বসংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। নগরগুলোর সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নির্মূল

করে ফেলা হয়। বুখারা, সমরকন্দ, হিরাট, গজনি, কাশান, চীনসহ আরও কিছু নগরে নারকীয় ঘটনা ঘটে। এসব জায়গায় চেঙ্গিস খানের সেনাবাহিনী নারীদের ওপর নির্মম নির্যাতন করে। শিল্পী-কারিগরদের দাসে পরিণত করা হয়। বাদবাকিদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আলামুত অভিযানের কয়েক মাস পর বাগদাদ ও দামেস্ক নগরী দুটো পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করা হয়েছিল।

আলামুত দুর্গে হাসান সাব্বাহর একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে ফেলার আগে হালাকুখানের এক ইতিহাসবিদের কৃপায় কয়েকটি পবিত্র কুরআন, বই এবং দু/একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষা পেয়েছিল। ওই পাণ্ডুলিপি থেকে হাসান সাব্বাহ এবং তার মতবাদ সম্পর্কে মানুষ কিছুটা জানতে পারে।

পারস্য সাম্রাজ্যও মোঙ্গলদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। খোরাসানের তিনটি বিখ্যাত নগরী যেগুলো শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ছিল, মোঙ্গলদের হামলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ নগরীগুলো আর সমৃদ্ধিশালী হিসেবে গড়ে ওঠেনি। এগুলোর মধ্যে ওমর খৈয়ামের প্রিয় শহর নিশাপুর ছিল। খোরাসানের অন্য নগরীগুলো ছিল মার্ভ ও বলখ। আরেকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের কথা মানুষ ভুলেই গিয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পর এর পাশে নতুন একটি শহর গড়ে ওঠে, যার নাম তেহরান। তবে আশ্চর্যজনকভাবে চেঙ্গিস খানের সেনাবাহিনীর কাছে সমরকন্দ কিছুটা আনুকূল্য লাভ করে। পরবর্তীকালে তৈমুর লং এ শহরের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটান।[১]

তরুণ অবস্থায় ওমর খৈয়ামের বহুমুখী প্রতিভার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। তা পারস্য সুলতান মালিক শাহের কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি হিরে চিনতে ভুল করেননি। একদিন গভীর কালো চোখের সুদর্শন যুবকটির ডাক পড়ল সুলতানের দরবারকক্ষে। তাঁর অতলান্ত জ্ঞান, গভীর চিন্তাশক্তি সুলতানকে মুগ্ধ করল। তিনি চান ওমর পারস্যের জন্য একটি নির্ভুল সৌরপঞ্জিকা তৈরি করে দেবে।

মিশরীয়রা সৌরপঞ্জিকা আগেই আবিষ্কার করেছে। তারাই প্রথম ৩৬৫ দিনের সৌরপঞ্জিকা প্রচলন করে। তবে তাদের পঞ্জিকায় হিসাবের কিছু গরমিল রয়ে গেছে। সুলতান মালিক শাহ ও নিজাম-উল-মুলকের সাহায্যে ওমর একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। মানমন্দিরে একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ আর মিশরীয়দের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি প্রায়-নির্ভুল একটি সৌরপঞ্জিকা তৈরি করেন। মালিক শাহের সম্মানে ওই পঞ্জিকার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জালালি পঞ্জিকা'। এ পঞ্জিকাটি বৃহত্তর ইরানে এগারোশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যায় ওমরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও সুলতান মালিক শাহের দরবারে জ্যোতিষী গণনার জন্যই বেশি সুখ্যাতি পেয়েছিলেন। মালিক শাহ তাঁকে বন্ধু হিসেবে মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু এজন্য তিনি অহংকারী হয়ে ওঠেননি।

---

১ আমিন মালুফ, 'ওমর খৈয়ামের সমরকন্দ'।

ওমর যুক্তি দিয়ে ধর্মকে বুঝতে চেয়েছেন। ধর্ম নিয়ে তর্ক জুড়ে দিতেন। আজান পড়লে সবাই মসজিদে উপস্থিত হলেও ওমর নামাজ পড়তে যান না। তার ওপর তিনি বিধর্মী গ্রিকদের বিজ্ঞান ও দর্শনের বই পড়েন। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেন। ধর্মান্ধরা এসব মোটেও ভালো চোখে দেখেনি। এরমধ্যে তিনি নতুন একটি মতবাদ দাঁড় করালেন–'সূর্য স্থির। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।' এ যে প্রচলিত ধারণার ওপর আঘাত! ওমর খৈয়ামকে এজন্য অনেক খেসারত দিতে হলো।

সুলতান মালিক শাহের হঠাৎ মৃত্যু হলে ওমর একেবারে বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। তিনি রাজ-জ্যোতিষীর পদটি হারান। তাঁর গড়ে তোলা আরাধ্য মানমন্দিরটি মৌলবাদীরা পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে। নষ্ট হয়ে যায় বহু গবেষণালব্ধ কাজ। ওমর নিজামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকের চাকরি করছিলেন। সে চাকরিটিও চলে যায়। তিনি নাকি পাঠদানের সময় ছাত্রদের কাছে খোদাদ্রোহিতার কথা প্রচার করেন। ছাত্রদের বিধর্মী বানাচ্ছেন। এসব ছিল মিথ্যে অপবাদ। চাকরি হারিয়ে ওমর খৈয়াম অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রহসনমূলক বিচারে তাঁকে বাধ্য করা হয় তাঁর প্রিয় শহর ছেড়ে যেতে।

ওমরের পূর্বসূরি এবং শিক্ষক ইবনে সিনাকে ধর্মান্ধদের কবলে পড়তে হয়েছিল। নিশাপুরের ধর্মান্ধরা মসজিদে একত্র হয়ে ইবনে সিনাকে নাস্তিক বলে ঘোষণা দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ফিকাহ্‌শাস্ত্রের সাথে মাদ্রাসার কোমলমতি বালকদের 'বেদাত' জ্ঞান দিচ্ছেন। বিধর্মীদের কায়দায় শরীরতত্ত্ব বা চিকিৎসাবিদ্যা শেখাচ্ছেন। ঝাড়-ফুঁকের জায়গায় অসুস্থদের ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করে তুলছেন। একদিন তারা মসজিদ থেকে মিছিল করে সোজা মাদ্রাসায় যেয়ে ইবনে সিনার কক্ষে ঢুকে সব বই বের করে পুড়িয়ে দেয়। মুফতির ফতোয়ায় তিনি চাকরিচ্যুত হন। ইমাম আল-গায্‌যালিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ করা হয়।

ইমাম গায্‌যালি ইবনে সিনা এবং ওমর খৈয়ামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার–সেটা চিকিৎসা বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যাই হোক–বিরোধিতা করেছিলেন। কট্টরপন্থিদের হাত থেকে বাঁচতে ইবনে সিনাকে তাঁর অবশিষ্ট লুকোনো কিছু বই নিয়ে স্পেনে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তাঁর গবেষণা অবশ্য থেমে থাকেনি। একটি গবেষণাগার স্থাপন করে তিনি তাঁর গবেষণা কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। আল্-কান্দি ও আল্-ফারাবিকেও একই পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল।

শুধু কি ইবনে সিনা, আল-কান্দি, আল-ফারাবি কিংবা ওমর খৈয়াম? ইয়োরোপেও তাঁদের মতো সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীদের ভাগ্যে একই পরিণতি ঘটেছিল। বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক গ্যালিলিও গ্যালিলির কথাই ধরুন, যিনি দুরবিন আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছিলেন।

ওমর খৈয়ামের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর পর ইতালির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্যালিলিও। তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বটি অঙ্ক কষে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমর্থন করেছিলেন। 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।' এ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করলেন। বাইবেলের বাণীকে অস্বীকার করে গ্যালিলিও বললেন–'পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু নয়।'

যাজকদের মতে, এটি সাংঘাতিক ধৃষ্টতা। ব্যস, গুরুতর অভিযোগ করা হলো তাঁর বিরুদ্ধে।

নাস্তিক তিনি ক্যাথলিকদের অনুসৃত ধর্মকে প্রায় অস্বীকার করে বসেছেন। অমান্য করেছেন ক্যাথলিক চার্চ প্রধান পোপ অষ্টম আরবানের আদেশ। পোপ আরবান জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসের মতবাদ ভুল বলে প্রমাণ করতে গ্যালিলিওকে আদেশ দিয়েছিলেন। অথচ গ্যালিলিও কি না এ মতবাদকেই জোরালোভাবে সমর্থন করলেন! অ্যারিস্টটল তাদের পূজনীয়। তাঁর মতবাদও অস্বীকার করা হলো! এমনিতেই ইয়োরোপে কট্টরপন্থি ক্যাথলিকদের লড়তে হচ্ছে প্রোটেস্টান্টদের সাথে। গ্যালিলিওর এ মতবাদ প্রোটেস্টান্টদের পক্ষে যাচ্ছে এবং যেটা তাদের আরও শক্তিশালী করবে। ঠিক এ সময়ে তাঁর মতবাদ যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হলো। রোমের ভ্যাটিকান সিটির বিশাল কক্ষে গ্যালিলিওর বিচারকাজ চলল বেশ অনেকদিন ধরে। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো, কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করেছিলেন বলে ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন, 'তোমার মতামত উঠিয়ে নাও তবে প্রাণে বেঁচে যেতে পার।'

গ্যালিলিও তাই করলেন, পুড়িয়ে-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলেন। তবে তাঁকে গৃহবন্দি করা হলো আমৃত্যু পর্যন্ত এবং তাঁর সব বই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এত কিছুর পরও তিনি গোপনে তাঁর মতে যা সত্য তা-ই লিখে চলছিলেন।

ওমর কি নাস্তিক ছিলেন? এ প্রশ্ন অনেকের মনে। তবে তিনি যে আল্লাহর অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস রাখতেন তাঁর কবিতার কোনো কোনো স্তবকে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শাস্ত্রীয় আচার ও কার্যকলাপে বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক মহাশক্তির উপাসনার শিক্ষা দিতেন। এসব তাঁর অনৈসলামিক আচার-ব্যবহার এবং অপরাধ বলে কট্টরপন্থিরা ধার্য করলেন। তিনি একবার হজ পালন করতে মক্কায় গিয়েছিলেন। কিন্তু মোল্লাদের বাধার কারণে হজ পালন না করে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। যার ইসলামের কার্যকলাপের প্রতি বিশ্বাস নেই তার আবার হজ পালন করা! আবার অনেকের মতে, তিনি হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

বলা হয়, বৃদ্ধ বয়সে ওমর ধর্মে-কর্মে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেটা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। নিজের হৃদয়কে সুধিয়েছেন–

'ডরিলে না কভু আখেরি অনল, তৌবা-বারিতে শুচি না হলে
মরণ ঝঞ্ঝা নিভালে দেউটি বসুধা তোমায় লবে কি কোলে?'
ওমর আবার বলছেন–
'কৃত পাপ স্মরি, ওহে খইয়াম, বক্ষ বিদারি কী ফল বল,
অনুশোচনায় শত চিৎকারে রোধিয়াছে কবে করম ফল।
পাপ যদি ভবে কেহ না করিবে, গাফ্‌ফার নাম কেন সে ধরে!
কিসের ভাবনা 'গোফ্‌রান' খোদা রয়েছে মজুদ পাপীর তরে।'